জিহাদি আন্দোলনের পর্যালোচনা

আমাদের দেশের ইসলামী আন্দোলনসমূহের ক্রমাগত ব্যার্থতার অন্যতম প্রধাণ কারণ হচ্ছে,

উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমাদের হাতে মুসলিম বিশ্বের আধিপত্য খর্ব হওয়ার পর থেকে শুরু হওয়া সংঘাত ও আন্দোলনের কারণ, প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবিশ্বাস্য রকমের অজ্ঞতা।

এখানে, ব্যার্থতা বলতে বোঝানো হচ্ছে, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের ফলাফল হাতছাড়া হওয়া, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রবল না হওয়া। আরো সহজ করে বললে যুগেরে পর যুগ পার হওয়া সত্ত্বেও, ইসলামের সামাজিক ও ব্যাপক কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার সাধারণ কোনো রোডম্যাপ বা প্রস্তাবনার "আশ্চর্যজনক" অনুপস্থিতি।

এখন অবধি ব্যার্থ সাব্যস্ত আন্দোলনসমূহের মাঝে শুধু নিয়মতান্ত্রিক দলগুলোকে বোঝানো হচ্ছে, তা নয়।

বরং, যারা গতানুগতিক, 'নিয়মতান্ত্রিক' কাজের বাইরে গিয়ে দাওয়াহ ও প্রতিরোধের মানহাজ গ্রহণ করেছেন, তারাও এই ব্যার্থতার মিছিলে অংশ নেয়াদের অন্তর্ভুক্ত।

আর একথা এই আন্দোলনের বন্দী, নিহত ও সদা

অবস্থান পরিবর্তনকারী সদস্যদের আত্মত্যাগকে স্বীকার করে নিয়েই বলা হচ্ছে। আরো ভালো করে বললে, এই মহান ব্যাক্তিদের কুরবানীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মুল্যায়নের দাবী থেকেই বলা হচ্ছে। যেন তাদের রক্ত আর ঘাম বৃথা না যায়।

এও স্মর্তব্য, অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় শরঈভাবে তাদের জবাবদিহিতা ইন শা আল্লাহ অনেক কম। (তানজিম আদ দাওলার কথা অবশ্য ভিন্ন।)

শায়খ আবু মুসআব আস সুরি তিনটি প্রজন্মে নবুওয়াতী মানহাজের উপর পরিচালিত বিপ্লবীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং চলমান ৩য় প্রজন্মকে পূর্বের দুই প্রজন্মের ফিকর ও মেহনতের সাথে নিজেদের যুক্ত করার আহবান করেছেন।

শুধুমাত্র হাকিমিয়াহ, গণতন্ত্র বা দারুল হারবের মাসআলায় সঠিক অবস্থান জানাকেই যারা মানহাজের ব্যাপারে জ্ঞান রাখা সাব্যস্ত করে থাকেন, তারা আসলে আন্তর্জাতিক নের্তৃত্বের ফিকর, ইতিহাস ও পরিকল্পনার ব্যাপারে সাধারণ আগ্রহ ও মনোযোগও দেন নি।

যার ফলে আমরা দেখি, সালাফদের চিন্তাধারা ও আন্দোলনের আলোকে আমাদের দেশে এখনো পরিপূর্ণ ও কার্যকর মানহাজের রূপরেখা সামনে আসেনি। আরো ভালো করে বলতে গেলে বিশেষ ব্যাতিক্রম ব্যাতীত এব্যাপারে সম্ভবত জানাশোনা জরুরী মনে করেন নি।

বিগত ৩০ বছরে আমাদের দেশে "মানহাজি" শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করা হয়, এমন আন্দোলনগুলোর মেহনত, বিবৃতি, অডিও-ভিডিও, প্রবন্ধ ও প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করলে, এবাস্তবতাই উঠে আসে। অথচ, কল্যাণকর হলেও পূর্ণাঙ্গ মানহাজের আলোচনা আমাদের সামনে আসেনি।

এহতভাগ্যজনক বাস্তবতার মূল কারণ, নব্বই দশকে ব্যাপকতা লাভকারী এই মহান আন্দোলনের নের্তৃত্বের ইতিহাস, অধ্যায়ন, লেখনি, মেহনত ও ফিকরের ব্যাপারে হতাশাজনক পর্যায়ের উদাসীনতা।

শায়খ আবু মুসআব নিজ কিংবদন্তিতুল্য কিতাব "দাওয়াতুল মুকাওয়ামা" -তে এব্যাপারে অত্যন্ত উপকারী আলোচনা করেছেন। যে আলোচনার নির্যাস হচ্ছে-

'১৯২৪ সালে খেলাফতের পতন হয়। এরপর আমাদের স্পষ্ট দুশমনরা অর্থাৎ রোমানদের উত্তরসূরী পশ্চিমারা ও তাদের দেশীয় দালালরা আমাদের সাথে দীনি, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ময়দানে যা ক্ষতিই করেছে- তার সমস্ত দিকের জ্ঞান বিপ্লবী প্রজন্মের থাকা উচিত।

হক ও বাতিলের মাঝে চলমান সংঘাতের সারকথা ইতিহাস অধ্যায়নের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। যখন আপনি ইতিহাস পড়বেন এবং এই বৈশ্বিক কুফরের অনিস্টতা, কপটতা উপলব্ধি করবেন, কেবল তখনই বুঝতে পারবেন কেন সংঘাত ও আন্দোলন অপরিহার্য ছিল।

যখন থেকে সেকুল্যার মডার্নিস্ট পশ্চিমা আধিপত্য বিশ্বে প্রবল হয়েছে, তখন থেকেই এই অপশক্তি কিভাবে মানবতা ও মানুষের হকের ক্ষতি করে আসছে, তা যখন বুঝে চলে আসবে তখন আপনার আন্তরিকভাবে বুঝতে পারবেন আপনারা কেন সংগ্রাম করছেন এবং এই সংঘাত ও বিপ্লবের প্রয়োজন কেন?

আমি লিখছি এই উদ্দেশ্যে যে, ভবিষ্যৎ মারহালার জন্য ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এক মানহায পেশ করা।

এই অতীত অধ্যায়ন এবং এর ব্যাপারে অবগত হওয়া একটা লম্বা শিকলের ন্যায়, যা আমাদের মানবজাতি ও সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে আমার সংযুক্ত করে। অতীত ইতিহাস ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বুৎপত্তি অর্জন করার ব্যাপারে আমরা এটা বলি যে, সাধারন বিপ্লবী বা মুজাহিদরা যদি এব্যাপারে অজ্ঞ হয়, তাহলে তা তার তা জন্য ঠিক হতে পারে। কেননা তার জন্য এসমস্ত কথার এত জরুরত নেই। সে তো আনুগত্য করে যাবে।

কিন্তু সুনির্বাচিত, অগ্রগামী বিপ্লবী নের্তৃবৃন্দ এবং ভবিষ্যতে আগত প্রজন্মের জন্য একথার অনুমতি নেই যে, সে এই চলে যাওয়া যুগ ও বিপ্লব, সংগ্রামের পর্যায় থেকে শিক্ষা গ্রহন করবে না। কিংবা অতীত প্রজন্ম থেকে উপদেশ হাসিল করবে না, ঘটনাবলীর হিকমতকে বুঝবে না, এটা তাদের জন্য জায়েজ নয়।

মানহায থেকে দূরে থাকা সাধারণ সদস্য বা আনুগত্যকারীর জন্য এটা অনুমতি থাকতে পারে যে, সে এই বক্তব্যসমুহ বুঝবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি সমগ্র উম্মাহকে নেতৃত্বে অংশ নিতে চায়, উম্মতের নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রজন্মের খেদমত করতে চায়, তার কোনো অজুহাতও নেই যে, সে এথেকে অজ্ঞ থাকবে।

তার জানা থাকা উচিত যে, শরিয়াহর শাসন, উসমানি খেলাফতের পতন কেন হয়েছে, কোন লোকদের হাতে হয়েছে? এবং এই ইহুদি খ্রিস্টান পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের কি কি ক্ষতি করেছে?

এমনকি পৃথিবীর সুচনা থেকে আজ পর্যন্ত হক ও বাতিলের মধ্যে যে লড়াই চলছে, তার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য কী এবং আর ত্রুটি কোথায়, সবই জানা মুজাহিদের জন্য জরুরি।

তাই এই সময়ের মুসলিমদের হাতিয়ারসমূহের মধ্যে এক অতিগুরুত্বপূর্ন হাতিয়ার হলো এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।

উস্তাদ আব্দুল কাদের আওদাহ বলেন,

"জাহেল ব্যক্তি এই উম্মতকে চালাতে পারবে না চাই তার যতই ইখলাস থাকুক না কেন।"

(শায়খের বক্তব্যের সারকথা সমাপ্ত)

তাই যতক্ষণ না দীর্ঘ ও ব্যাপক আত্মত্যাগে ইতিমধ্যেই অতিবাহিত হওয়া আন্দোলনের নের্তৃত্ব ফিকরের পরিচ্ছন্নতা ও বাস্তবতার যথাযথ জ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক না করতে পারবেন; ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ব্যাপক ভুমিকা রাখা সম্ভব হবে না।

এটা নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশ্যে মেহনতকারীদের জন্য যেমন সত্য, গোপনে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের জন্যও সমান সত্য।

চাই, যতই প্রচন্ড পরিভাষা, আবেগাপ্লুত আহবান কিংবা দুর্দান্ত দাবীর সমারোহ হোক না কেন।

(২)

বাস্তবতা হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তি, ব্রিটেনের 'গ্লোরিয়াস' বিপ্লব, অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্কিন ও ফরাসী বিপ্লব; পাশাপাশি শিল্প বিপ্লব, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ এবং উসমানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতনের ফলে,

ইউরোপের জাতিয়তাবাদী রাষ্ট্রের ধারনা ব্যাপকভাবে বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত হয়ে যায়। প্রথমে ইউরোপে এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; তারপর গত শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে এই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়।

তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, সারা বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে সমতল ভূমির রাষ্ট্রগুলোতে এই ব্যবস্থা এতো মজবুতভাবে জেঁকে বসেছে এবং এত বেশী প্রভাব ফেলেছে যে-এই রাষ্ট্রগুলোতে শাসনযন্ত্রের বিপরীতে বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনার প্রক্রিয়া অল্প কয়েকটি ধারাতে অনেকটা সীমিত হয়ে গেছে।

আবার, স্নায়ুযুদ্ধের দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে চলমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক কার্যক্রম ও সংগঠনের রাজনৈতিক লাইনের বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার ক্ষেত্রে এসকল সেক্যুলার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো থেকে কিছু বিশ্লেষণ মুসলিমদের গ্রহন করার প্রয়োজন হয়েছে।

যেমন:

- পিরামিড ধাঁচের 'হায়ারার্কিকাল' গোপন সংগঠনের ধারণার বড় একটি অংশ এসেছে ভ্লাদিমির লেনিনের কর্মপন্থা থেকে।

- হিকমাতুল্লাহ লোদীর 'নিসাবে হারব' মাওবাদী ধারার গেরিলা যুদ্ধের পরিবর্তিত রূপ।

- এছাড়াও, শায়খ আবু উবাইদা আল কুরাইশীর "বৈপ্লবিক যুদ্ধসমূহ"-এ মাও সে তুং-এর এবং আরও একাধিক প্রবন্ধে প্রুশিয়ান জেনারেল ক্লাউসভিতস এর চিন্তাধারার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনের ধারণার পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা 'চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ' /**Fourth generation warfare** – এর ধারণা তিনি নিয়েছেন মার্কিন বিভিন্ন সামরিক বিশ্লেষকের গবেষনা থেকে

- আবার শায়খ আবু মুসআব আস সুরি লিডারলেস আন্দোলনের ধারণা এনেছেন মার্কিন ফার রাইট/উগ্র ডানপন্থী আন্দোলনের তাত্ত্বিকদের থেকে।

কাজেই আন্দোলন, বিপ্লব এবং সংগঠনের কর্মপদ্ধতির মতো বিষয়গুলোতে সেক্যুলার বিভিন্ন ঘরানা থেকে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করার বিষয়টি ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আমাদের আলোচনার জন্য, আমরা বামপন্থী বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি।

মার্ক্সবাদী আন্দোলনকে সাধারণত মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট আন্দোলন বলা হয়; যার বাস্তব সফলতা প্রথম দেখা যায় লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে সংঘটিত অক্টোবর বিপ্লবে।

পরবর্তীতে মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট বিপ্লবের চিন্তাধারা প্রধাণত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয় -

১) স্টালিনিস্ট: লেনিনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হওয়া জোসেফ স্টালিনের চিন্তাধারায়।

২) ট্রটস্কিস্ট: আরেক বলশেভিক নেতা, লেনিনের অন্যতম প্রধান সহচর ও রেড আর্মির প্রতিষ্ঠাতা লিও ট্রটস্কির চিন্তাধারায় এবং,

৩) মাওয়িস্ট; চীনা বিপ্লবের রূপকার মাও সে তুং এর চিন্তাধারায়।

আমরা যদি আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রগামী ভূমিসমূহের দিকে তাকাই এবং আমাদের নেতা শায়খ আবু উবাইদা আল কুরাইশি রহ. এর রচনাবলীর ক্ষেত্রে লক্ষ্যপাত করি তাহলে বোঝা যায় যে, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, মালি, পাকিস্তানের মতো ভূমিগুলোতে সীমান্তবর্তী অঞ্চল বা ইরাকের ময়দানসমূহে মূলত মাওবাদী গেরিলা আন্দোলনের ধারাকে সামনে রেখে পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে।

সেখানে মাওবাদী ধারায় আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে, শুরু থেকেই সামরিক ও রাজনৈতিক সুসমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে বিপ্লবীরা অগ্রসর হয়।

বহিঃশক্তির আগ্রাসন হলে বা স্থানীয় প্রশাসন গণইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে বিপ্লবীরা প্রান্তীয় দুর্গম অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল দখলের মাধ্যমে শহর দখলের দিকে অগ্রসর হওয়াই সংক্ষেপে এ ধারার প্রক্রিয়া। এটা এজন্য যে, গ্রামাঞ্চলে শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল থাকে।

এখন মূল কথা হচ্ছে,

এই গেরিলা আন্দোলনের ধারা কিংবা মাওবাদী ধারা-যে নামেই ডাকা হোক না কেন-আমাদের মতো সমতল ভূমির দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়।

আমাদের দেশে যে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা আন্দোলন সম্ভব নয় তা মোটামুটি তাত্ত্বিক, বাস্তব এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে স্পষ্ট।

বাংলাদেশে ইতিপূর্বে এ ধারায় যেসব প্রচেষ্টা হয়েছে, তার প্রতিটিই বাস্তব ময়দানে পন্ড হয়েছে। সেকুল্যারদের মধ্যেও এই ধারায় কাজের চেষ্টা হয়েছিল এবং ফলাফল ব্যার্থতাতেই পর্যবসিত হয়েছিল।

ষাটের দশকের একদম শেষদিকে মাওবাদী গেরিলা যুদ্ধের জন্য সংগঠন গড়ে তুলেছিল সিরাজ শিকদার। পরবর্তীতে জাসদের গণবাহিনীও এপথে কিছুটা চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মিলেছে ব্যর্থতা।

এ ব্যাপারে গণবাহিনীর একটি অঞ্চলের তৎকালীন নেতা, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্নার একটি বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। মান্না বলেছিল-

"এ দেশে গেরিলা যুদ্ধের কোনো সুযোগ নেই।"

চীনা ধারার মাওবাদী বিপ্লবের তত্ত্ব যে উপমহাদেশে (এবং বাংলাদেশে) এদেশে অচল, এ প্রসঙ্গে বামপন্থীদের নানা বিশ্লেষণও আছে। যেমন **SUCI (Socialist Unity Center of India)**-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বামপন্থী তাত্ত্বিক শিবদাস ঘোষ বলেন,

"মাও সে তুংয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রাকবিপ্লব চীনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং তার চরিত্র ছিল প্রাকপুঁজিবাদী বিকেন্দ্রীভূত এবং মধ্যযুগীয় (প্রি ক্যাপিটালিস্ট ডিসেন্ট্রালাইজড মেডিয়্যাভাল নেচারের) । {*অর্থাৎ অনেকটা পাকিস্তানের **FATA** অঞ্চলের কাবায়েলি বেল্টের মতো)

উপরন্তু, গোটা চীনে অখণ্ড সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না।

সমগ্র চীন দেশটা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রভাবিত অঞ্চল হিসেবে আলাদা আলাদা টুকরোতে বিভাজিত ছিল এবং এই সমস্ত অঞ্চলগুলো আলাদা আলাদাভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার কতগুলো ওয়ারলর্ডদের দ্বারা শাসিত হতো।

... ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনব্যবস্থার সাথে কি এর কোন মিল আছে? বরং এখানে একটি অত্যন্ত সুসংহত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান। রাষ্ট্রের প্রকৃতির দিক থেকে আমাদের দেশের বিপ্লবের তত্ত্ব চীনের বিপ্লবের তত্ত্বের সাথে এক হতে পারে না।"

শিবদাস ঘোষের উপসংহার ছিল চীনের মতো গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা তৈরি করে শহর দখল করার কৌশল উপমহাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। তার মন্তব্য হলো,

"লড়াইটা যে দেশেই শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিবে, সে দেশেই গেরিলা যুদ্ধের নীতি ও সংগ্রামকৌশল সেই দেশের বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হবে।

তাছাড়া প্রতিটি দেশের নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য যেখানেই বিপ্লবী শ্রেণী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বে ও কৌশলে কিছু না কিছু সংযোজন ঘটাতে বাধ্য হবেন।

তা না হলে তারাও কেবল 'কপি' করে চালাতে পারবেন না।

ফলে আপনারা বুঝতে পারছেন, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে শহর দখল করার সংগ্রাম কৌশল এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব গ্রহণের, যা নকশাল পন্থীরা এক করে ফেলেছেন, তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

(শিবদাস ঘোষের বক্তব্য সমাপ্ত)।

উম্মাহর নেতৃবৃন্দের বিশ্লেষন এবং এ ভুখন্ডের বিভিন্ন তানজিমের অভিজ্ঞতা এবং বামপন্থী ধারার তাত্ত্বিকদের পর্যালোচনা ইত্যাদির আলোকে সামগ্রিকভাবে এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে,

আমাদের দেশে আপাতদৃষ্টিতে গেরিলা যুদ্ধের কোনো সুযোগ নেই।

এমনকি চরম বৈরী হানাদার গোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন সত্ত্বেও অতীত ইতিহাস এদেশে এ পদ্ধতির ব্যর্থতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন, ১৯৩০ এ চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন গেরিলা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।

এখানে ব্যতিক্রম হিসাবে ১৯৭১-কে টানার সুযোগ নেই। কারণ '৭১ এর যুদ্ধ যতটা পূর্ববাংলার, ততটাই ভারতীয়দের। এছাড়াও, স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং ১১০০ মাইল দূরের কমান্ড সেন্টার, যুদ্ধ শুরুর আগেই পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসনের জেতার সম্ভাবনা শেষ করে দেয়।

সাথে আরো যোগ করা যায় যে, ১৯৬৫ এর যুদ্ধের পর অস্ত্র বিক্রীর ক্ষেত্রে আরোপিত আমেরিকান স্যাংশনের সুবিধা নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক বিমান হামলার ফলে যুদ্ধ রাতারাতিই শেষ হয়ে যায়। তাই '৭১ এর যুদ্ধকে ঢালাওভাবে গেরিলা যুদ্ধ বলা আসলে সঠিক হবে না।

অর্থাৎ, তিউনিশিয়া, মরক্কো, মিশর বা বাংলাদেশের মতো ভূমিগুলোতে আফগান বা সোমালিয়ার ন্যায় গ্রামাঞ্চল বা প্রত্যন্ত অঞ্চল কেন্দ্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনার চিন্তা করাটা বাস্তবসম্মত নয়।

নিকট অতীতে সমতল ভূমিতে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সফলতার কিছুটা বাস্তবতা দেখা গিয়েছে শামে। লিবিয়াতেও প্রচ্ছন্ন কিছু ফলাফল পাওয়া গেছে। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'গণতান্ত্রিক' প্রতিবিপ্লবীদের কারণে নষ্ট হয়েছে তিউনিশিয়া ও মিশরে শরিয়াহর শাসন ফিরিয়ে আনার সুযোগ!

তাহলে আমাদের মতো সমতল ভূমিতে ইসলামী শাসন অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ফিরিয়ে আনার শরঈ, সার্বজনীন ও ঐতিহাসিক রূপরেখা কি হতে পারে?!

ইতিহাস, বাস্তবতা এবং প্রাজ্ঞ উলামা ও নের্তৃবৃন্দের চিন্তার আলোকে সুনির্দিষ্ট মানহাজ ও কর্মকৌশল কি এক্ষেত্রে!?

এব্যাপারে সদুত্তর খুজে বের করতে না পারলে বা খোজার মেহনত না করা হলে,

জিহাদি সংগঠনসমূহ ব্যার্থতার গর্ত থেকে নিকট ভবিষ্যতে বের হয়ে আসতে পারবে; এমন আশা করা বাস্তবসম্মত হবে না।

আল্লাহই ভালো জানেন।

وَ مَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَ مَا تَوْفِيْقِىْۤ
اِلَّا بِاللّٰهِ ؕعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ